মানুষী কথা

চতুর্থ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০২১

সম্পাদকীয়
জন্মশতবর্ষে এ কালের গার্গী: সুকুমারী ভট্টাচার্য
প্রসেনজিৎ মুখোপাধ্যায় ১
বিশেষ প্রবন্ধ
ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে শ্রমজীবী পরিবারে নাবালিকাদের অবস্থা
শত্রুঘ্ন কাহার ৪
প্রেম বিদ্রোহ বিপ্লব
পার্থ সারথি ১০
ধারাবাহিক রচনা
কিছু শোনা কিছু দেখা
কল্যাণী মুখোপাধ্যায় ১৫
ছোটগল্প
হাওয়া
নবনীতা বসু হক ১৮

সম্পাদক ও প্রকাশক :
প্রজ্ঞাপারমিতা দত্ত রায়চৌধুরী

সহকারী সম্পাদক : সুতপা দেব

সম্পাদক মন্ডলীর পক্ষে :
সোমা ঘটক, কল্যাণী মুখোপাধ্যায়, জয়ন্তী ভট্টাচার্য, কৃষ্ণা দাস, প্রসেনজিৎ মুখোপাধ্যায়

মুদ্রণ : অপটিমা, ৪ নবীন পাল লেন কলকাতা ৭০০ ০০৯
১৩৪ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোড, কলকাতা ৭০০০৮৫ থেকে প্রকাশিত

প্রচ্ছদ শিল্পী : নন্দলাল বসু

বিনিময় ৩০ টাকা

সম্পাদকীয়

বিয়ে নিয়ে চিন্তা মেয়েদের মনে এমনভাবে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, তার বিকল্প কোনও ভাবনা মেয়েদের তথা সমাজের মনে আর নেই। অনেকেই গর্বের সঙ্গে বলছেন কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে মেয়েদের বিয়ের বয়স আঠারো থেকে একুশ করার কথা ভাবা হয়েছে, কিন্তু বিয়ে ভালো না খারাপ, কোন বয়সটা স্বীকৃত হলে বেশি ভালো সে চিন্তায় না গিয়ে প্রশ্ন তোলা যায় মেয়েদের জীবনের সঙ্গে বিয়ে নামক প্রথাটিকে যেভাবে গেঁথে দেওয়া হয়েছে, তা কবে বন্ধ হবে? সমাজ মেয়েদের বিবাহিত হিসেবেই দেখতে চায়, সেক্ষেত্রে শিক্ষা -অশিক্ষার প্রশ্ন ওঠে না। আঠারো থেকে একুশ এই বয়সের পরিবর্তন মেয়েদের জীবনে এমন কিছু উন্নয়ন ঘটাবে না, শুধুমাত্র 'বাবার বাড়ি'তে 'বোঝা' হিসেবে থাকার মেয়াদ বাড়বে। এতে জীবনের বদল বোঝায় না। একটি মেয়েকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টায় না। বদলাতে হবে দৃষ্টিভঙ্গী, মানুষ হিসেবে ভাবতে হবে পুরুষের পাশে মেয়েদেরও।

নানা বৃত্তে নারী
রমারায়চৌধুরী বক্তৃতামালা
নারী অধিকারের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মূল্যবান সংকলন।
দাম ১২০ টাকা
প্রকাশক - মানুষীর বইঘর
চলভাষ : ৯৪৩২২০৯৭৭০

(পত্রিকায় লেখকের বক্তব্য ও মতামত সম্পূর্ণ তাঁদের নিজস্ব। এ বিষয়ে সম্পাদকের কোনও দায় ও দায়িত্ব নেই।)

বিশেষ প্রবন্ধ

ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে শ্রমজীবী পরিবারে নাবালিকাদের অবস্থা

চটকলকে কেন্দ্র করে যে শ্রমিক শ্রেণী গড়ে ওঠে তাঁদের পরিবারের নাবালিকাদের জীবন নিয়ে লিখেছেন **শত্রুঘ্ন কাহার**

'চটকলের সম্পর্কে কথা না বলে কলকাতা সম্পর্কে কিছু লেখা সম্ভব নয়' বিংশ শতকের প্রথম দশকে জনৈক পথপ্রদর্শকের (Guide) এ কথাটা খুব একটা অত্যুক্তি নয়।[১] বস্তুত বাংলার শিল্পায়ন ঘটে এই চটকলকে কেন্দ্র করে। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে হুগলী নদীর তীরে দ্রুত এই শিল্পের প্রসার ঘটে। এবং এই শিল্পকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে এক নতুন শ্রেণী 'শ্রমিক শ্রেণী'। ১৯০৬ খ্রিঃ সরকারি অফিসার বি. ফলির বিবরণ থেকে জানা যায়, ২০ বছর পূর্বে চটকলের বেশিরভাগ শ্রমিকই ছিল স্থানীয় বাঙালিরা। কিন্তু কালক্রমে এদের স্থান পূরণ করে বিহার, উত্তরপ্রদেশের অবাঙালি শ্রমিকেরা।[২] প্রধানত শ্রমিক চাহিদা, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি এবং তাদের আর্থিক অভাবই তাদের কলকাতামুখী করে তোলে। এর সঙ্গে এক নতুন জীবনের স্বপ্ন অবশ্য তাদের হাতছানি দিয়েছিল। এই নতুন জীবনের হাতছানিতে শুধু পুরুষরাই সাড়া দিয়েছিল তা কিন্তু নয়, এক বিপুল সংখ্যক মেয়ে শ্রমিকও এর অংশ হয়েছিল। এস. আর. দেশপাণ্ডে তাঁর রিপোর্টে পুরুষ ও মহিলা জুট শ্রমিকের সংখ্যার ওপর যে তথ্য দিয়েছেন তার অনুপাত বার করলে তা দাঁড়ায় ৫:১এ।[৩] কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তীতে চট শিল্পের চিত্র পাল্টে যেতে থাকে। দেশ ভাগের অভিঘাত এসে পড়ে চটশিল্পের উপর। এর সঙ্গে যুক্ত হয় আধুনিকতার আঘাত। এর ফলে চট শিল্পে নেমে আসে মন্দা। এই মন্দার প্রকোপ এসে পড়ে মহিলা শ্রমিকদের ওপর। আবার স্বাধীনতা পরবর্তীতে এই চটকল শ্রমিকদের চরিত্রগত পরিবর্তনও লক্ষ্য করা যায়। প্রাক-স্বাধীনতা আমলের শ্রমিকদের দ্বৈত চরিত্রের অর্থাৎ অর্ধ কৃষক অর্ধ শ্রমিকের ক্রমশ অবসান ঘটতে থাকে এবং পূর্ণ শ্রমিক রূপে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। পাশাপাশি তারা সপরিবারে এই চটকল অঞ্চলগুলিতে বসবাস করতে শুরু করে। সুতরাং একদিকে এই চটকলগুলিতে নারী শ্রমিকদের সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস, অন্যদিকে সপরিবারে চটকল শ্রমিকদের বাংলার স্থায়ী বাসিন্দায় পরিবর্তন হওয়ায় এই চটকল শ্রমজীবীদের জীবনে আমূল পরিবর্তন সংঘটিত হয়।

মূলত স্বাধীনতা উত্তর পর্ব থেকে চটকল অঞ্চলগুলিতে বসবাসকারি নারীদের জীবনেও পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগে।

মূলত স্বাধীনতা উত্তর পর্ব থেকে চটকল অঞ্চলগুলিতে বসবাসকারি নারীদের জীবনেও পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগে। একদা যে নারীশ্রমিকরা চটকলে কাজ করে উপার্জনের মাধ্যমে স্বাধীন সত্ত্বা অর্জনে ব্যস্ত ছিল সেই নারী শ্রমিক অধুনা এই চটকল শ্রমজীবী পরিবারের অন্দরমহলের আনুসাঙ্গিক কর্ম সম্পাদন করে পরিবারের পুরুষ অধিনস্ত জীবে পরিণত হয়েছে। এটি লক্ষণীয় যে নারীদের যে শুধু অধস্তন হিসেবে গণ্য করা হয় তা নয়, বরং তাদের পুরুষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবহার করার এক সম্পদ বলে গণ্য করা হয়। চটকল অঞ্চলের নারীদের এরূপ করুণ পরিস্থিতির মাঝে পরিবারে নাবালিকাদের অবস্থা কেমন ছিল তাই এ প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয়।

মূলত স্বাধীনতা পরবর্তী কালে চটকল শ্রমিকেরা সপরিবারে চটকল অঞ্চলগুলিতে বসবাস আরম্ভ করে। প্রথম দিকে বহু নাবালিকারা এই চটকলে শ্রমিক রূপে যোগ দেয়। তাদের কাজে যোগ দেওয়ার এক করুণ ছবি পাওয়া যায় অসমাপ্ত চটাব্দ থেকে। লেখকের ভাষায় 'সমারুর বউ গোদাবরী-বিলাসপুরে তাঁর বাড়ি। জগদ্দলে যখন প্রথম এসেছিল, তখন তার বয়স আঠারো কি উনিশ। নিখুঁত কালো চেহারা-নিটোল স্বাস্থ্য। তার মত আরও পনের-ষোলটি মেয়ে এসেছিল তার সঙ্গে বিলাসপুর অঞ্চল থেকে।'[৪] গোদাবরী আর তার সঙ্গে যারা এসেছিল তারা সকলেই কাজ পেল ঠিকই কিন্তু তারা সর্দারদের বাঁদীতে পরিণত হয়, চলে শারীরিক তথা মানসিক অত্যাচার। এই চটকল অঞ্চলগুলিতে নারীদের বস্তু রূপে গণ্য করা হত। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে পড়ে যায় প্রখ্যাত বাংলা কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম। বাংলার গ্রামীণ নারী সমাজের এক পূর্ণাঙ্গ চিত্র ফুটে ওঠে তাঁর লেখায়। যদিও চটকল জীবন সম্পর্কে তাঁর বিশেষ কোনও লেখা না থাকলেও, তাঁর লেখা এক ছোট গল্প 'মহেশ'এ এই চটকলগুলিতে শ্রমিক জীবন তথা নারীদের অবস্থা সম্পর্কে এক অস্পষ্ট ধারণা মেলে। উক্ত গল্পে গফুর যখন তার মেয়ে আমিনাকে গ্রাম ছেড়ে ফুলবেড়ের চটকলে যাওয়ার কথা বলে তখন তাঁর মেয়ে অবাক হয়ে যায় এবং তার মনে পড়ে ''ইতিপূর্বে অনেক দুখেও পিতা তাহার কলে কাজ করিতে রাজি হয় নাই;— সেখানে ধর্ম থাকে না, মেয়েদের ইজ্জত-আব্রু থাকে না, একথা সে বহুবার শুনিয়াছে''।[৫] তৎকালীন চটকল শিল্পে নারীদের অবস্থা এই ছোট এক বাক্য থেকে বোঝা যায়। মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের অসমাপ্ত চটাব্দতে লেখক জগদ্দলের চটকলের কালু সর্দারের কাহিনি বর্ণনা করেছেন। কাহিনিতে চটকলে কাজ করতে আসা মহিলাদের করুণ অবস্থার বিবরণ পাওয়া যায়। লেখকের ভাষায় .'কালু সর্দার একবার দেশ থেকে ফিরল, সঙ্গে এক দঙ্গল মেয়ে। দেশে কালুকে সবাই ডাকত 'দেওতা' বলে। সত্যি তার ব্যবহার ছিল দেবতার মতো। মনে হত যেন পরের উপকার করবার জন্যেই সে জন্মগ্রহণ করেছে— নিজের বলতে তার কিছু নেই। সেই কালু সর্দার চটকলে ফিরে এসে ধরল আর এক মূর্তি। মেয়েগুলোকে রাখল সারি সারি কটা ঘরে প্রায় বন্দিনীর মতো। বলে দিল, তার হুকুম ছাড়া এক পা-ও তারা এদিক ওদিক যেতে পারবে না। মেয়েগুলো ভয়ে জড়সড়। কালু সর্দার সারাদিন মদ খেয়ে টং হয়ে ঘুরে বেড়ায়, চেঁচামেচি করে আর রাতে যখন যাকে খুশি ডেকে পাঠায় তার ঘরে। এমনই চললো কিছুদিন, তারপর শখ খানিকটা মিটলে কালু সর্দার তাদের একে একে কাজে লাগিয়ে দিল'।[৬] কিন্তু ১৯৪০ এর দশক থেকেই চটকল শ্রমজীবীদের জীবনে কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটতে থাকে। মিলে কর্মরত নারীর সংখ্যা কমতে থাকে অন্যদিকে চটকল শ্রমিকেরা স্থায়ীভাবে বাংলায় বসবাস করতে শুরু করায় তাদের জীবনে এক স্থিরতা লক্ষ্য করা যায়।[৭]

প্রথমেই বলতে হয় এই চটকল শ্রমিকদের পরিবারে মেয়ে সন্তানেরা ছিল এক অযাচিত জীব। সংসারে মেয়ে সন্তানের চেয়ে ছেলে সন্তান অধিক কাম্য হওয়ায়, লিঙ্গ বৈষম্য ছিল তীব্র।

প্রথমেই বলতে হয় এই চটকল শ্রমিকদের পরিবারে মেয়ে সন্তানেরা ছিল এক অযাচিত জীব। সংসারে মেয়ে সন্তানের চেয়ে ছেলে সন্তান অধিক কাম্য হওয়ায়, লিঙ্গ বৈষম্য ছিল তীব্র। মেয়েদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রত্যহ দিনের কাজকর্মে এই বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। বস্তুত পরিবারের সকলে মনে করে ছেলেরাই

সারণি - ১

বছর	কারখানা সংখ্যা	প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ সংখ্যা	প্রাপ্তবয়স্ক মহিলা সংখ্যা	শিশুশ্রমিক সংখ্যা
১৯১২	৬১	১৪৫.৩৮৯	৩১.৩২৯	২৩.০০৭
১৯১৩	৬৪	১৫৮,২৬১	৩৪,০১০	২৪,১০৬
১৯১৪	৬৯	১৬৭,৮৫৮	৩৬,৮০০	২৫,৯০৯
১৯১৫	৭০	১৮১,৪৪৫	৪০,৬৭৪	২৬,৬৪৬
১৯১৬	৭০	১৯১,০৩৬	৪২,১৪৫	২৭,৬০৩
১৯১৭	৭১	১৯২.,৬৬৭	৪১,৩৯৫	২৭,৩২০
১৯১৮	৭২	১৯৯,৯৭৭	৪৩,২৭৮	২৭,৭০৯
১৯১৯	৭২	২০১,০০৯	৪৩,১১২	২৮,৬২৮
১৯২০	৭৩	২০৭,২৫৫	৪৪,৫৪৫	২৮,৫২১
১৯২১	৭৭	২০৭,৯০৮	৪৪,৭০৫	২৯,২৩৫
১৯২২	৮০	২৩৯,৬৬০	৪৯,২৫৭	২৮,২৬৭
১৯২৩	৮৩	২৪২,৬৫২	৫১,৪৯৫	২৮,৪০০
১৯২৪	৮৫	২৫২,১০৭	৫৪,৮০১	২৭,৮২৩
১৯২৫	৮৩	২৫৬,৩১২	৫৫,৫১১	২৬,৪৭৪
১৯২৬	৮৬	২৫৩,৯৩৫	৫২,৮২৭	২০,৭৮৫
১৯২৭	৮৫	২৫৩,৬৮১	৫২,৯৩৫	১৯,২৪৯
১৯২৮	৮৬	২৬০,৩৪২	৫৩,৬৭৮	১৭,৮৭৯
১৯২৯	৯০	২৬৭,৭১৭	৫৪,৬৭০	১৭,২৭৮
১৯৩০	৯১	২৬৪,৪১৭	৫২,১১৪	১১,৬৪৬
১৯৩১	৯৩	২২২,৫৭৩	৪২,২৫৪	৩,৪৬২
১৯৩২	৯৪	২১২,৫০৫	৪০,৪৯৪	১,৫১৫
১৯৩৩	৯২	২০৮,২৪৬	৩৭,৩৩৭	১,১৩৪
১৯৩৪	৯৩	২১৩,৮৯৪	৩৬,৯৩২	৯১৫
১৯৩৫	৯৫	২২৫,৩৭২	৩৭,৭৪৯	২৭৮
১৯৩৬	৯৪	২৩৩,৪৮১	৩৮,২৬১	৪
১৯৩৭	৯৬	২৪৯,৭৩৭	৩৭,৯৯৭	৯
১৯৩৮	৯৭	২৪২,৩৪২	৩৬,৬৮৩	৯
১৯৩৯	১০১	২৪৩,৪৯৬	৩৭,৬৯৯	৩৪
১৯৪০	১০১	২৪৮,০৪৬	৩৬,৬৪০	৩৪
১৯৪১	১০১	২৫১,৩৮৮	৩৫,২৫৫	৩৮
১৯৪২	১০১	২৫২,৭৯৯	৩৫,০৮৩	৩২
১৯৪৩	১০১	২৪৫,১২৫	৩৪,৭৫৯	৩৫
১৯৪৪	১০১	২৩১,১২১	৩৬,০০৫	৬৭

সূত্র : এস আর দেশপান্ডে, ভারতের চটশিল্পে শ্রমিকদের অবস্থা তদন্তের বিষয়ে রিপোর্ট (দিল্লি ১৯৪৬), পৃ. ৬।

মা-বাবার বৃদ্ধ জীবনে দেখাশোনা করবে। মৃত্যুর পর মুখাগ্নি দেবে তথা বংশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, অন্যদিকে মেয়ে বিয়ের পর অন্যের বাড়িতে চলে যাবে ফলে স্বাভাবিকভাবে ছেলেমেয়ের মধ্যে পার্থক্য প্রাথমিক স্তরেই গড়ে ওঠে। তবে চটকল অঞ্চলগুলিতে ঘুরে দেখা গেছে পরিবারের যাবতীয় কাজ এই নাবালিকারাই অল্প বয়স থেকে পালন করে থাকে। বাবা, কোনও কোনও ক্ষেত্রে মা-বাবা উভয় বাইরে কাজ করায় পরিবারকে দেখাশোনার দায়িত্ব থাকত এদের কাঁধে। সুতরাং এই নাবালিকারাই ছিল চটকল শ্রমজীবী পরিবারের মেরুদণ্ড। অথচ এরাই ছিল অবহেলিত, নিপীড়িত। স্বাধীনতা উত্তর পর্বে এদের জীবনে যে পরিবর্তনগুলি লক্ষ্য করা যায়, সেটিকে তিনটে পর্বে ভাগ করে আলোচনা করা যায়। এগুলি হল যথাক্রমে—প্রথম পর্ব ১৯৪৭ থেকে ১৯৭০, দ্বিতীয় পর্ব ১৯৭০-১৯৯০ এবং তৃতীয় পর্ব ১৯৯০-২০১৭।

১৯৭০ থেকে ৯০-এর দশক পর্যন্ত চটকল শ্রমজীবী পরিবারে পরিবর্তনের দ্বিতীয় পর্বরূপে চিহ্নিত করা যায়।

স্বাধীনতা পরবর্তী প্রথম দুই দশক চটকল জীবনে পরিবর্তন ছিল ক্ষীণ। প্রাক্-স্বাধীনতা চরিত্রগুলি বজায় ছিল। ফলে, তাদের জীবনে গ্রামীণ প্রভাব ছিল প্রবল। গ্রামীণ প্রথা অনুসারে এই চটকল অঞ্চলগুলিতেও পরিবারের যাবতীয় দায়িত্ব ছিল এই নাবালিকাদের কাঁধে, কিন্তু কোনও অধিকার তাদের দেওয়া হত না। খাওয়া-দাওয়া থেকে শুরু করে প্রত্যেক ক্ষেত্রে এক ধরনের দ্বিচারিতা লক্ষ্য করা যায়। যাবতীয় ভালো খাবারের অধিকারী ছিল পুত্রসন্তানেরা, তাদের থেকে কিছু অবশিষ্ট থাকলে তবেই তা এই নাবালিকাদের ভাগ্যে জোটে। শিক্ষা ক্ষেত্রেও দেখা যেত, বাড়ির পুত্রসন্তান অল্প বিস্তর শিক্ষা পেলেও মেয়েরা প্রাথমিক শিক্ষা থেকেও বঞ্চিত থাকত। সাধারণত ভাবা হত মেয়েরা শিক্ষিত হয়ে করবেই বা কি, দিনের শেষে তো তাদের বাড়ির কাজই করতে হবে। ফলে এর মাশুল দিতে হল সমগ্র কনিউনিটিকে। ঘরের মেয়েরা অশিক্ষিত হওয়ায় ১৯৯০ দশক পর্যন্ত সমগ্র চটকল অঞ্চলগুলিতে শিক্ষার হার ছিল নগণ্য। অন্যদিকে খুব অল্প বয়সে মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার প্রচলন ছিল। ফলে ১৫-১৬ বছর বয়সেই তাদের বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হয়। বিয়েতে মেয়েপক্ষকে দিতে হত যৌতুক। এই যৌতুক বা পণ মেটানোর জন্য অনেক সময়ে মেয়ের বাবাকে জর্জরিত হতে হত ঋণে। সম্ভবত এ কারণেও মেয়েরা ছিল পরিবারের কাছে অযাচিত সন্তান। কম বয়সে বিয়ে, যথাযোগ্য আহারের অভাব প্রভৃতির ফলে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে হয় এদের। সামগ্রিকভাবে বলা যায়, স্বাধীনতা পরবর্তী প্রথম দুই দশকে এদের জীবন ছিল পারিবারিক জাঁতাকলে পিষ্ট। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে এদের জীবনেও পরিবর্তন আসে, যদিও তা ছিল সীমিত।[৮]

১৯৭০ থেকে ৯০-এর দশক পর্যন্ত চটকল শ্রমজীবী পরিবারে পরিবর্তনের দ্বিতীয় পর্বরূপে চিহ্নিত করা যায়। স্বাভাবিকভাবে এই পর্ব নাবালিকাদের জীবনেও কিছু পরিবর্তন নিয়ে আসে। এই পর্ব অর্থনৈতিক দিক থেকেও খুব গুরুত্বপূর্ণ। চটকলগুলিতে রাজনৈতিক দাবিদাওয়া বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং ‘পলিথিন’, ‘পলিব্যাগ’ প্রভৃতির ব্যবহার বেড়ে যাওয়ায় চটের উৎপাদন হ্রাস পায়। যার প্রত্যক্ষ প্রভাব এসে পড়ে শ্রমজীবী পরিবারের ওপর। অর্থনৈতিক অভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় এই শ্রমজীবী পরিবারকে বিকল্প উপার্জনের পথ খুঁজতে হয়। এক্ষেত্রেও পরিবারের নাবালিকারা অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করে। তারা বিভিন্ন ধরনের কুটির শিল্পের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে এবং

বাড়িতে বসেই উপার্জনের পথ বার করে। প্রসঙ্গক্রমে বলতে হয় ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের বিস্তৃর্ণ অঞ্চল জুড়ে এই সময় পর্বে পুঁতি তৈরি, রাখী তৈরির কাজ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ক্ষেত্রসমীক্ষায় দেখা যায়, এক্ষেত্রে চটকল পরিবারের অল্পবয়সী নাবালিকারাই এই কাজে যুক্ত থাকত।[৯] তবে অর্থনৈতিকভাবে এরা পরিবারের সহায়ক হলেও সামাজিকভাবে কিন্তু পরিবারের অধস্তন হিসেবেই থেকে যায়। শিক্ষা ক্ষেত্রে এদের অধিকার এই পর্বেও তেমন স্বীকৃত হয় নি। তবে উল্লেখ্য পরিবারের আয় সীমিত হওয়ায় পুত্রসন্তানই শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পেত। অল্প বয়সে বিবাহের প্রচলন এই পর্বেও লক্ষ্য করা যায়। সম্ভবত, পরিবারের কাছে মেয়েরা বোঝাই ছিল, এবং চেষ্টা করা হত যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি তাদের বিয়ে দিয়ে এ ভার লাঘব করা যায়। পণ প্রথার প্রকোপ আরও বৃদ্ধি পায়। অনেকক্ষেত্রে ক্ষেত্র সমীক্ষার দরুণ এই নাবালিকাদের পরিবারের তথা প্রতিবেশীদের দ্বারা যৌন নির্যাতনের ঘটনার কথা জানা যায়, তবে ঘটনাগুলি সালিশির মাধ্যমে মিটিয়ে নেওয়া হত।[১০] সুতরাং অর্থনৈতিকভাবে এই পর্বে এদের জীবনে পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেলেও সামাজিক ক্ষেত্রে এরা নির্যাতিত, অবহেলিতই থেকে যায়।

তবে, ১৯৯০-এর দশকে ভারতে বিশ্বায়নের নীতি গ্রহণের সাথে সাথে এই চটকল শ্রমজীবীদের পারিবারিক জীবনেও তার প্রভাব পড়ে। শ্রমজীবী পরিবারের থাকা-খাওয়া, ওঠা-বসা প্রত্যেক ক্ষেত্রে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। স্বাভাবিকভাবে চটকল পরিবারের নাবালিকারাও এই পরিবর্তনের শরিক হয়। এই পর্বে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই নাবালিকারা অনেকটাই স্বতন্ত্র ভূমিকা পালন করে। কুটির শিল্পের পাশাপাশি, পরিচারিকার কাজ, কলসেন্টার ইত্যাদিতে যোগ দিতে দেখা যায়। ১৯৮৬ তে কেন্দ্রীয় সরকারের অপারেশন ব্ল্যাকবোর্ড-এর সুবাদে চটকলের নাবালিকারা এই পর্বে শিক্ষার আলো পেতে শুরু করে যার পূর্ণাঙ্গ প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় বিংশ শতকের প্রথম দশক থেকেই। এই পর্বে সরকারের কন্যাশ্রী প্রকল্পের ফলে মেয়েদের শিক্ষার হার দ্রুত বাড়তে থাকে। শিক্ষার আলো পাওয়ায় তাদের অধস্তন চরিত্রটি অনেকটাই পাল্টেছে। ২০১৫তে একটি ক্ষেত্র সমীক্ষায় দেখা যায় ১৫-১৮ বছরের মেয়েদের মধ্যে ৮৩শতাংশ

সারণি - ২
শিশুদের স্কুলে নথিভুক্তির চিত্র

Age (in years)	Boys						Girls					
	On Going		Never Enrolled		Drop Out		On Going		Never Enrolled		Drop Out	
	Nos.	%	Nos.	%	Nos.	%	Nos.	%	Nox.	%	Nos.	%
3-5	27	60.0	17	37.8	1	2.2	17	50.0	17	50.0	0	0
6-14	120	94.5	2	1.6	5	3.9	125	96.2	1	0.8	4	3.1
15-18	62	71.3	3	3.4	22	25.3	69	83.1	0	0.0	14	16.9

Jute Mill Workers of West Bengal : A Situational analysis towards enhancing their wellbeing. A survey done by Riddhi Foundation, Study sponsored by National Jute Board, p. 51.

মেয়েই তাদের প্রাথমিক শিক্ষা পূর্ণ করতে সক্ষম হয়েছে।[১১]

উল্লেখ্যযোগ্য ভাবে উচ্চ শিক্ষার হারও বৃদ্ধি পেয়েছে। আধুনিক শিক্ষার আলো পাওয়ার ফলে কম বয়সে বিয়ের প্রতিবাদও নাবালিকাদের মুখে শোনা যায়, যা তাদের স্বাধীনচেতার পরিচয় তুলে ধরে। মা বাবারাও সচেতন হওয়ায় ও সরকারি প্রকল্পের টাকাপয়সা পাওয়ায় বাল্য বিবাহের মত ঘটনা থেকে দূরে সরে এসেছে। অন্যদিকে মেয়েদেরকেও পরিবারের পুত্রসন্তানের সমানাধিকারের দাবিতে সোচ্চার হতে দেখা যায়। যদিও আজও এই সমাজে মেয়ে অপেক্ষা পুত্রই অধিক কাম্য। তবে মেয়েদের প্রতি পরিবারের দিক থেকে যে দ্বিচারিতার শিকার হতে দেখা যেত তা ক্রমশ কমতে আরম্ভ করেছে। ক্ষেত্র সমীক্ষার দরুণ এ পর্বেও তাদের ওপর যৌন নির্যাতন হতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে এই পর্বে যে যৌন নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে তার বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, কোনও সালিশির মাধ্যমে মেটানোর চেষ্টা দেখা যায় না।[১২] সুতরাং বলতে হয় মেয়েরা এক্ষেত্রেও তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়েছে, যার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় তাদের প্রতিবাদের মধ্যে। পরিশেষে বলতে হয়, স্বাধীনতার ৭০ দশকের পরেও এই চটকল অঞ্চলে শ্রমিক সংগ্রামের পাশাপাশি আর এক ধরনের লড়াই সমাজের অগোচরে লড়ে যাচ্ছে শ্রমিক পরিবারেরই অন্য এক অংশ, যাদের আওয়াজ শ্রমিক মহল্লার বাইরে পৌঁছাতে পারে না। তবে তারা হার মানে নি, ক্রমাগত লড়াইয়ের মাধ্যমে তাদের অধিকারগুলোকে বুঝে নিতে আরম্ভ করেছে। অনেক বাধা, প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে তাদের মুক্তির পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে।

উল্লেখ্যযোগ্য ভাবে উচ্চ শিক্ষার হারও বৃদ্ধি পেয়েছে। আধুনিক শিক্ষার আলো পাওয়ার ফলে কম বয়সে বিয়ের প্রতিবাদও নাবালিকাদের মুখে শোনা যায়, যা তাদের স্বাধীন চেতার পরিচয় তুলে ধরে।

সূত্রনির্দেশ :

১. W. K. Firminger, Thacker's Guide to Calcutta (Calcutta, 1906), p. 237

২. বি. ফলি : রিপোর্ট অন লেবার ইন বেঙ্গল, ১৯০৬।

৩. S. R. Deshpande, Report on an Enquity into Conditions of Labour in the Jute Mill Industry in India (Delhi, 1946), p. 6.

৪. অমল দাস : বাংলার চটকল শ্রমিকদের ওপর সর্দারি প্রভাব (১৮৭৫-১৯২০), অনুসন্ধানে শ্রমিক ইতিহাস, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ২০১৩।

৫. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'মহেশ', সুলভ শরৎ সমগ্র ২, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ১৭২৮-৩২।

৬. মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, অসমাপ্ত চটাব্দ, কলকাতা, ১৯৬৩, পৃ. ৯৬-১০০।

৭. Dipesh Chakraborty, Rethinking Working Class History : Bengal 1890 to 1940 (Princeton, 1989), p. 121

৮. ক্ষেত্রসমীক্ষা, গারুলিয়া, জগদ্দল তৎসংলগ্ন অঞ্চল।

৯. সাক্ষাৎকার - নিরঞ্জন প্রসাদ (রানিরাখী), তারিখ-২০.০৫.২০১৬

১০. ক্ষেত্রসমীক্ষা দ্বারা প্রাপ্ত তথ্য, তারিখ-২৫.০৬.২০১৬

১১. Jute Mill Workers of West Bengal : A situational Analysis towards Enhancing their Wellbeing Riddhi Foundation, Study Sponsored by National Jute Board, p. 51.

১২. সাক্ষাৎকার - রমেশ চৌধুরী, তারিখ-০৫.০৮.২০১৬